তথ্য কণিকা ২০২০

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০ ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ

মুজিব বর্ষের আহবান
লাগাই গাছ, বাড়াই বন

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গনভবনে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০ ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।
১৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গনভবনে বৃক্ষরোপণ

সূচীপত্র

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫	০২
বাংলাদেশের বন	০৩
পাহাড়ী বন	০৩
শাল বন	০৪
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	০৪
জলাভূমির বন	০৫
সৃজিত উপকূলীয় বন	০৬
উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য	০৬
জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন	০৭
বন অধিদপ্তরের নার্সারী	০৮
সামাজিক বনায়ন	০৮
সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য	১০
রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্ব	১০
সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন	১১
বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি	১২
রক্ষিত এলাকা সমূহ	১৩
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া	১৪
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য	১৫
বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী	১৬
বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা	১৭
বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট	১৭
শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার	২০
বাংলাদেশে প্রকৃতি পর্যটন	২২
সাফারী পার্ক	২৩
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার	২৪
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর	২৫
জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	২৭
বন সেক্টরে সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৮
প্রকল্প তালিকা	২৮
বাংলাদেশ ফরেস্ট ইনভেন্টরী	৩০
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প	৩৩
বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ	৩৫
সুন্দরবনের বাঘ শুমারী	৩৬
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৩৭
বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা	৩৮
ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)	৩৯
বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার	৩৯
বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার	৩৯
বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন	৪০
উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ	৪১
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস	৪৩
সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যাদি	৪৪
Flyway Sites in Bangladesh	৪৯
বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৫৩
বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর	৫৩

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫

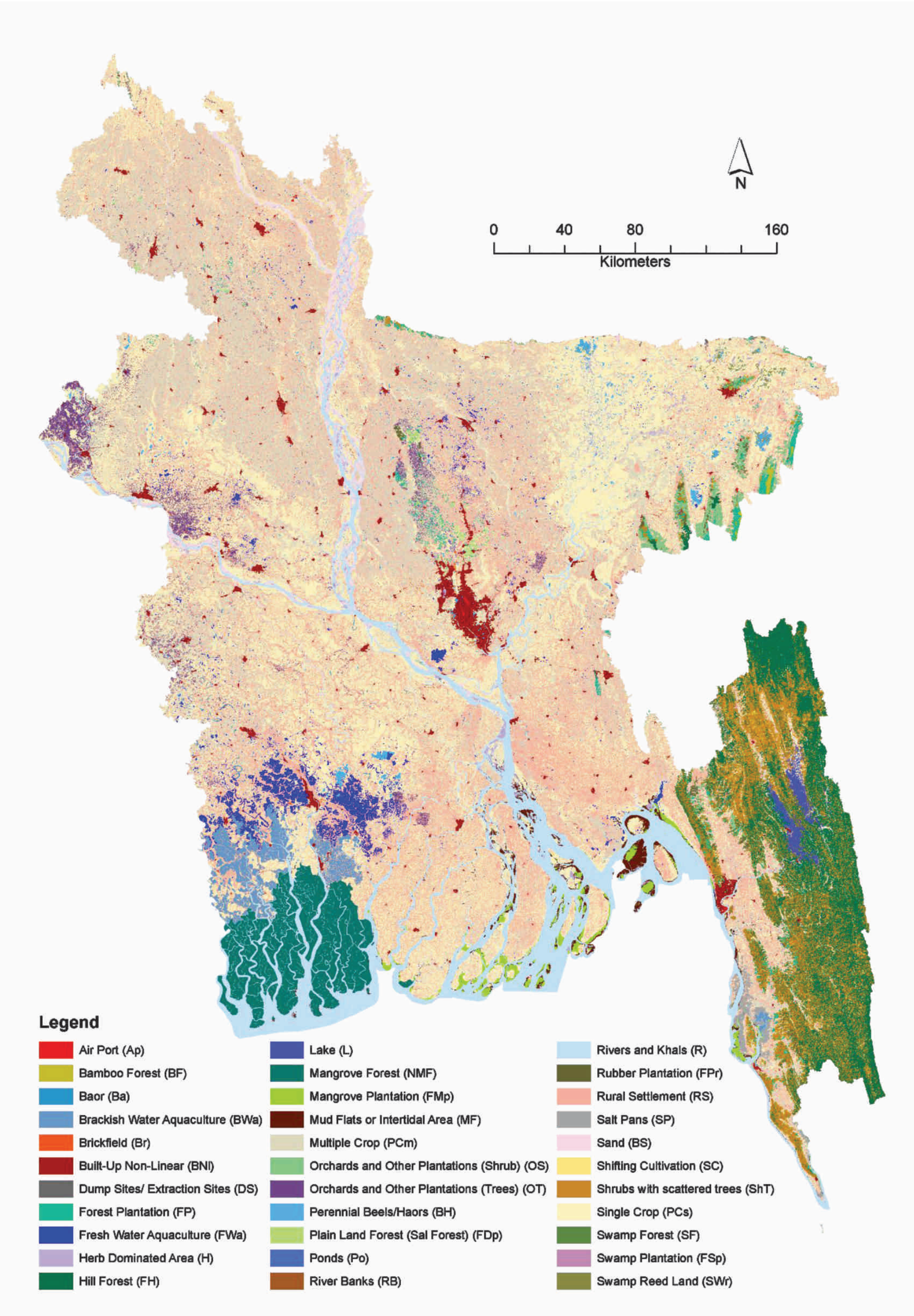

বাংলাদেশের বন

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। **বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%**। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

পাহাড়ী বন

অবস্থান: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকা।

সাঙ্গু নদীর পাড়ে পাহাড়ী বন

পরিমাণ: উল্লিখিত জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ী বনভূমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.৫৪% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৪৩%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।

শাল বন

অবস্থান: এ বন মূলতঃ কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শাল বন রয়েছে।

গাজীপুরের শাল বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.৮১% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৭%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের মূল প্রজাতি শাল (*Shorea robusta*) যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এ ছাড়া এ বনে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন ইত্যাদি প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান: খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন
(সুন্দরবন)

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.০৭% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: সুন্দরী, গেওয়া, গরাণ, কেওড়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়া ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি।

বন্যপ্রাণী: এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, অজগর ইত্যাদি।

নদী/খাল: এ বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

মৎস্য সম্পদ: শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও এক বিরাট আধার। ইলিশ, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, চিংড়ি, চিত্রা ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

বিশ্ব ঐতিহ্য: সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জলাভূমির বন

অবস্থান: সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত। রাতারগুল দেশের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত।

রাতারগুলের জলাভূমির বন, সিলেট

পরিমাণ: রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ০.০১%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে।

বন্যপ্রাণী: বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন মাছের আবাসস্থল ও প্রজননের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজিত উপকূলীয় বন

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃজন করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে। এ বন জেগে ওঠা চরভূমিকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় করে কৃষি কাজসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।

সৃজিত উপকূলীয় বন

পরিমাণ: এ বনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১২%।

উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মতো এ বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়।

বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল, বানর, বনবিড়াল, বালিহাঁস ইত্যাদি।

মৎস্য সম্পদ: এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারের একটি বিরাট উৎস। এখানে ভেটকি, পারসে, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়।

উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ় করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

- ❖ উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- ❖ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৯৪ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।

❖ উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন

বন অধিদপ্তর ও যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ গবেষণায় ২০১৪ সালের Landsat-স্যাটেলাইট ইমেজ (Image Resolution 30m) এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হল:

জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪ (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %	জেলা	বৃক্ষ আচ্ছাদন ২০১৪ (বর্গ কিঃ মিঃ)	বৃক্ষ আচ্ছাদন %
বাগেরহাট	২১০১.৫৫	৫০.৪৪	লালমনিরহাট	১২১.৯৯	৯.৮৪
বান্দরবান	৩৪০৩.৪৬	৭৩.৬৭	মাদারীপুর	১০৪.৫৪	৯.২৪
বরগুনা	৩০৬.৭৪	১৭.৯২	মাগুরা	১৭৫.৪৮	১৬.৮২
বরিশাল	৫৬৬.১১	২২.০৮	মানিকগঞ্জ	১৪৫.২৬	১০.৪৩
ভোলা	৬৬৩.৬৫	১৭.৫২	মৌলভীবাজার	৯০১.৩৫	৩৩.৩২
বগুড়া	২৬৭.৬০	৯.১৩	মেহেরপুর	৯০.৭৫	১২.৮৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৪.৭২	৬.৯৪	মুন্সিগঞ্জ	৫০.২১	৫.৩৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৯.৮৬	১৪.৩৭	ময়মনসিংহ	৮২০.৬৮	১৮.৯৪
চাঁদপুর	৩৪১.৫১	১৯.৯৩	নওগাঁ	১৫৭.১৫	৪.৫৯
চট্টগ্রাম	১৫৭২.৭৯	২৬.৮৪	নড়াইল	১০৫.৬৯	১০.৬৯
চুয়াডাঙ্গা	১৭৫.০৯	১৫.২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৩.০৯	৬.০৮
কুমিল্লা	৪১৬.৬৪	১৩.৩৬	নরসিংদী	৩৩৬.৬০	২৮.৯৮
কক্সবাজার	৬১৫.৫৭	২০.২৮	নাটোর	২৬২.৯১	১৩.৮১
ঢাকা	১৬৪.৪৩	১১.১৮	নেত্রকোনা	২৫৮.৫৮	৯.২৫
দিনাজপুর	১৫০.২১	৪.৩৫	নীলফামারী	১১১.১২	৬.৯৭
ফরিদপুর	২৫০.২০	১২.৩৩	নোয়াখালী	৫৪১.৮৪	১২.৬৫
ফেনী	২০৬.৯৭	২২.৩৪	পাবনা	২৬৮.৯২	১১.৩২
গাইবান্ধা	১৮১.২৭	৮.৪৪	পঞ্চগড়	৬৪.৬৯	৪.৬৪
গাজীপুর	৬১৫.৮৩	৩৩.৯২	পটুয়াখালী	৪৬৩.০৩	১৩.৩৪
গোপালগঞ্জ	১০৬.৩৬	৭.১৮	পিরোজপুর	৪৫২.৫১	৩৫.৫৩
হবিগঞ্জ	৪২৭.৩২	১৬.৩৭	রাজবাড়ী	১৫৫.৮০	১৩.৬৬
জামালপুর	২১৮.১৯	১০.৬১	রাজশাহী	২৬৩.৫৯	১০.৮৯
যশোর	৫৮৬.৯৯	২২.৯২	রাঙ্গামাটি	৪০১৪.৩৩	৭০.২৬
ঝালকাঠি	২৬৩.৮১	৩৫.৫০	রংপুর	২৮১.৭২	১১.৯৪
ঝিনাইদহ	৩৫৫.৯৬	১৮.২১	সাতক্ষীরা	১৩৩১.৩৮	৩৩.৬১
জয়পুরহাট	৬২.৬৭	৬.৩২	শরীয়তপুর	১৩৭.৯৮	১১.৪৯
খাগড়াছড়ি	১৯৮৬.৭৬	৬৭.৩১	শেরপুর	১৭৯.৯১	১৩.৭২
খুলনা	১৮০৯.৫১	৪০.৯১	সিরাজগঞ্জ	২২১.৬৪	৮.৮৩
কিশোরগঞ্জ	৩১৬.০২	১২.৩২	সুনামগঞ্জ	১৭৩.৯৫	৪.৭৫
কুড়িগ্রাম	২৩৬.২৭	১০.৩২	সিলেট	৬০১.৮৪	১৭.৫২
কুষ্টিয়া	২৫০.৪০	১৫.৩৬	টাঙ্গাইল	৭০৯.৭১	২১.০৩
লক্ষ্মীপুর	৪৩৮.৮০	২৯.২১	ঠাকুরগাঁও	৩০.৪৯	১.৭০
বৃক্ষ আচ্ছাদনের মোট ভূমির পরিমাণ				৩৩০১২	২২.৩৭

বন অধিদপ্তরের নার্সারী

বন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় মোট ১০১টি এসএফএনটিসি (সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এবং ৩১২টি উপজেলায় এসএফপিসি (উপজেলা সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র) রয়েছে। বন বিভাগে বিদ্যমান এই ৪১৩টি নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলদ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন ও সরকারী মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এসকল নার্সারীতে বিক্রয়/ বিতরণের জন্য ১২,৮০,০০০ টি চারা উত্তোলন করা হয়েছে। ২০০২ সাল হতে এ পর্যন্ত সারা দেশে ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নার্সারী কর্তৃক ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টি বিবিধ প্রজাতির বনজ, ফলদ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলন পূর্বক বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বছর পরিচালন ব্যয় খাতে ৩২৭ টি উপজেলায় ৬৬,৪৬,৩৭৫ টি এবং সুফল প্রকল্পের আওতায় ১৬৫ টি উপজেলায় ৩৩,৫৩,৬২৫ টিসহ মোট ১ কোটি চারা উত্তোলন পূর্বক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন হলো স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রম। ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করাই সামাজিক বনায়নের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা এবং তাদের খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবপত্র ও মূলধনের চাহিদা পূরণ করা। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি,পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক বনায়ন

আবর্তকাল ও উপকারভোগী নির্বাচন

সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানের আবর্তকাল ন্যূনতম ১০ বছর। সৃজিত স্ট্রিপ বাগানে প্রতি কিলোমিটারে সর্বনিম্ন ৫ জন এবং উডলট / ব্লক বাগান / বাফারজোন / এগ্রোফরেস্ট্রি / উপকূলীয় চরভূমি / ফোরশোর ইত্যাদি বাগানে প্রতি একরে ১ জন হিসেবে উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়। অধিকাংশ উপকারভোগী সৃজিত উডলট ও কৃষি বন বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, আনারস, গম, চীনাবাদাম, কচু, লেবু, সবজি এবং ঔষধি গাছপালা ও অন্যান্য ফসল চাষ করে লাভবান হন। অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী সামাজিক বন থেকে প্রথম ৭ বছর পর্যন্ত প্রুনিং ও থিনিং কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষের ফল, উৎপাদিত কৃষি ফসল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সকল আয় সম্পূর্ণরূপে উপকারভোগীগণ পেয়ে থাকেন এবং আবর্তকাল শেষে বৃক্ষ কর্তন পূর্বক লভ্যাংশ চুক্তিনামা অনুযায়ী উপকারভোগীদের মাঝে বন্টন করা হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ১৯৬০-এর দশকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮১-৮২ সাল হতে উত্তরবঙ্গের সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য বৃহত্তর ৭টি জেলায় কমিউনিটি ফরেষ্ট্রি প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের প্রচলন করে। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করেন। এ বিধিমালা আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে এ সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত বিধিমালায় সরকারি বনভূমিতে বনায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেক প্রদান

সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

১. সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৯ হাজার ৩১৩.৭৮ হেক্টর এবং ৭৩ হাজার ২২৩.৩৬ কিলোমিটার বাগান সৃজন করা হয়েছে।

২. সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ০১ হাজার ৪৮৮ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন, যাদের মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৪২ জন।

৩. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানের মধ্য হতে ৪৩ হাজার ৯৪৩ হেক্টর এবং ১৮ হাজার ৩৬২ কিলোমিটার বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য ১২২৭ কোটি ৮২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১০ টাকা।

৪. এ যাবৎ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৫৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৫ টাকা বিতরন করা হয়েছে।

৫. ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনঃ বনায়নের কাজে বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) ১১০ কোটি ২০ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৮৫ টাকা জমা হয়েছে ।

৬. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের এ যাবৎ রাজস্ব আয়ের পরিমান ৪৩৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৩২ টাকা।

৭. ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্যদের মাঝে ২১৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ২১৪ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্ব

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩১) অনুসারে "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোনো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দুর্বলতা দূর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আবশ্যক। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী ও অন্যান্য অংশীজন সরকারের পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও খাদ্যের উৎস এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে

সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা, বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আবাসস্থল এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবেও রক্ষিত এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দারিদ্র্য, জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ, অবৈধভাবে গাছকর্তন, বন বিভাগের পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, গবাদি পশুর বিচরণ, বনে আগুন এবং সর্বোপরি বনভূমি কৃষি ও জনবসতিতে পরিনত হওয়ায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা সমূহ হুমকির সম্মুখীন।

এ প্রেক্ষাপটে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় আটটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ২০১৮ সাল পর্যন্ত বনবিভাগ যথাক্রমে নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলি হুডস্ প্রকল্প (CREL, ২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় ২৮ টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রনয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন হবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করণ ও নুতন রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনায় নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক বনায়নে নার্সারিতে চারা উৎপাদন, পরিচর্যা, বাগান পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল করা হয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) অনুযায়ী ৩০% দুঃস্থ নারী উপকারভোগী হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। স্থানীয়

সংযোগ সড়ক বনায়নে নারী

জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অন্ততঃ দুইজন নারী থাকেন। বিধি ৭ এর (১) উপবিধিতে চুক্তির আওতায় উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও স্বামীকে সমান অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৭) অনুযায়ী গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস্ ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা সাধারণ ও নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পর্যায়ে এবং দাপ্তরিক পদমর্যাদায় নারীর অবস্থানকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১২,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,৩৫০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত প্রায় ২০,০০০ জন উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রক্ষিত এলাকা সমূহ

জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার ঘোষিত বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, সাফারী পার্ক, ইকো পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, জাতীয় ঐতিহ্য ও কুঞ্জবন- এ সকল এলাকা রক্ষিত এলাকার অন্তর্ভূক্ত। দেশে বর্তমানে রক্ষিত এলাকার (Terrestrial & Marine) পরিমাণ ৬,২৯,১০১.৬১ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪.২৬ শতাংশ।

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৪৮টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে ১৮টি জাতীয় উদ্যান, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ৩টি ইকোপার্ক এবং ১টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া রয়েছে (তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত)। তাছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য ০২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য:

১. রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
২. ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩. হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৪. চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৫. দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৬. পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৭. সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৮. টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৯. সোনার চর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১০. চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১১. টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১২. সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৩. সুন্দরবন পশ্চিম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৪. সুন্দরবন দক্ষিন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১৫. চাঁদপাই বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৬. দুধমুখী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৭. ঢাংমারী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৮. নগরবাড়ী- মোহনগঞ্জ (ডলফিন) অভয়ারণ্য
১৯. শিলন্দা নাগডেমরা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২০. নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২১. পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২২. শিবসা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য
২৩. ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য

জাতীয় উদ্যান:

১. ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান
২. মধুপুর জাতীয় উদ্যান
৩. রামসাগর জাতীয় উদ্যান
৪. হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান
৫. লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
৬. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
৭. নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান
৮. মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান
৯. সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
১০. খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান
১১. বাড়ৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান
১২. কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান
১৩. নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৪. সিংড়া জাতীয় উদ্যান
১৫. কাদিগড় জাতীয় উদ্যান
১৬. আলতা দিঘী জাতীয় উদ্যান
১৭. বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান
১৮. শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান

উদ্ভিদ উদ্যানঃ

১. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর

বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাঃ

১. রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা
২. আলতাদীঘি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা

ইকোপার্কঃ

১. চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক
২. টিলাগড় ইকোপার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র
৩. মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়াঃ

১. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২) এর ক্ষমতা বলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রঙ্গাপন মূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুর্নি ডলফিন) পাখনাহীন পরপয়েস/শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি (ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি ইত্যাদি) এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, থুট্টি হাঙ্গর, ফৌরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর ইত্যাদি) সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে "সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেকক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা করা হয় যার গড় গভীরতা ৯০০+ মিটার।

বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য

ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। ২০১৩ সালে ড. রেজা খান Wildlife of Bangladesh : A checklist বইতে ১০৬০ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে ৫৬ প্রজাতির উভচর, ১৬৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৭১০ প্রজাতির পাখি ও ১৩০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে।

আইইউসিএন এর ২০১৫ সালের জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ১১৬৩ প্রজাতির মেরুদন্ডী বন্য প্রাণী রয়েছে; তার মধ্যে ৪৯টি উভচর, ১৬৭ টি সরীসৃপ, ৫৬৬টি পাখি ও ১৩৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে ১৪১টি ক্রাইস্টাসিয়ান ও ৩০৫টি প্রজাপতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । তাছাড়া মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীসহ সর্বমোট ১৬১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

বাংলাদেশের বন, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপুল জীববৈচিত্র্যের সমাহার, রয়েছে কতিপয় বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ৪৭০ প্রজাতির ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া, ১৯৮৮ প্রজাতির শৈবাল, ২৭৫ প্রজাতির ফানজাই, ২৪৮ মস জাতীয় উদ্ভিদ, ১৯৫ প্রজাতির ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ, ৭ প্রজাতির নগ্নবীজি এবং ৩ হাজার ৬১১ প্রজাতির গুপ্তবীজি (২৬৩৩ প্রজাতির দ্বি-বীজপত্রী এবং ৯৮৮ প্রজাতির একবীজপত্রী) উদ্ভিদ রয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে ১৮-এ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরো বেগবান করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রটোকল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে; যেমন: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কনভেনশন (CBD), পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CMS), মহাবিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CITES) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর অবস্থা (IUCN-Red list of Bangladesh 2015)

দল	মোট বসবাসরত প্রজাতি	বিলুপ্ত	মহাবিপন্ন	বিপন্ন	সংকটাপন্ন	হুমকির সম্মুখীন	ঝুকিপূর্ণ নয়	অপর্যাপ্ত তথ্য	অপর্যাপ্ত তথ্য
স্তন্যপায়ী প্রাণী	১৩৮	১১	১৭	১২	৯	৯	৩৪	৩৯	৭
পাখি	৫৫৬	১৯	১০	১২	১৭	২৯	৪২৪	৫৫	০০
সরীসৃপ	১৬৭	১	১৭	১০	১১	১৮	৬৩	২৭	২০
উভচর	৪৯	০০	২	৩	৫	৬	২৭	৬	০০
মিঠা পানির মাছ	২৫৩	০০	৯	৩০	২৫	২৭	১২২	৪০	০০
ক্রাইস্টাসিয়ান	১৪১	০০	০০	২	১১	১	৪৭	৭৯	১
প্রজাপতি	৩০৫	০০	১	১২১	৭৫	০০	৮৪	৩২	০০
মোট	**১৬১৯**	**৩১**	**৫৬**	**১৯০**	**১৫৩**	**৯০**	**৮০২**	**২৭৮**	**২৮**

বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী

বাংলাদেশ এক সময় প্রাণী বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। IUCN এর ২০১৫ সালে প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত শত বর্ষের ব্যবধানে আমাদের দেশ থেকে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি স্তন্যপায়ী, ১৯টি পাখি ও ১টি সরীসৃপ প্রজাতি। বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর তালিকায় রয়েছে ভারতীয়, সুমাত্রান ও জাভান গন্ডার, বারশিংগা, দাগী হায়না, বন গরু, কৃষ্ণ ষাঁড়, নীলগাই, শ্লথ ভল্লুক, বুনো মহিষ, মিঠাপানির কুমির, সবুজ ময়ুর, ময়ুর, গোলাপী শির হাঁস, বাদি হাঁস, সারস, রাজ শকুন, স্পটবিল্ড পেলিকেন, বড় মদনটাক, বাংলা ফ্লোরিকেন, ছোট ফ্লোরিকেন, বারটেলড্ ট্রি ক্রিপার, কালোবুক প্যারটবিল, স্পট ব্রেস্টেড প্যারটবিল, বড় প্যারটবিল, ধূসর তিতির, রোফাস থ্রটেড পারট্রিজ, রাস্ট্রি ফ্রন্টেট বারউংগ, সোয়াম্প তিতির ও সাদা বক। যদি আমরা এখনই বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান না করি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক বন্যপ্রাণী আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ।

One-horned Rhinoceros
Rhinoceros unicornis

Javan Rhinoceros
Rhinoceros sondaicus

Asiatic Two-horned Rhinoceros
Didermoceros sumatrensis

Swamp Deer
Cervus duvauceli

Blackbuck
Antilope cervicapra

Nilgai
Boselaphus tragocamelus

Banteng
Bos banteng

Wild Buffalo
Bubalus bubalis

Gaur
Bos gaurus

Grey Wolf
Canis lupus

Striped Hyena
Hyaena hyaena

Marsh Crocodile
Crocodylus palustris

Pink-headed Duck
Rhodonessa caryophyllacea

Common Peafowl
Pavo cristatus

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা

বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩-এর আওতায় সরকার "বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০" প্রনয়ণ করেন। ক্ষতিপূরণের ধরন ও নির্ধারণের হার নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(১)	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ মারা গেলে	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
(২)	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ পঙ্গু হলে	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
(৩)	গবাদি পশু, ঘর-বাড়ী, গাছপালা, ফসল ইত্যাদি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা)

এ পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

ক্র: নং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপুরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১।	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২।	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩।	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪।	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫।	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬।	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭।	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
৮।	২০১৮-১৯	১১৫	৫	১	৭	১৬	-	১	৮৫	৪৩.০৫
৯।	২০১৯-২০	১২৩	-	-	১২	৩১	-	-	৮০	৫৪.৩৫
	মোট	৯৬১	১৬	৪৬	৪৫	১৯৯	০	৬	৬৬৩	৩৭১.০৯

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। বন্যপ্রাণী পাচার রোধে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (Wildlife Crime Control Unit) গঠন করা হয়।

সূচনালগ্ন হতেই সারাদেশে বন্যপ্রাণী ও ট্রফি উদ্ধার; উদ্ধারের পর বন্য এবং অনুকূল আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী মুক্ত করণ; নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর ট্রফি উদ্ধার, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং-উৎস সৃষ্টি ও ডাটাবেস তৈরি; বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখা; ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ে শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান জনবল

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকাতে বর্তমানে মোট ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। উল্লিখিত জনবলের মধ্যে ১০ জন রাজস্ব খাতভূক্ত এবং ০৬ জন বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত।

বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে "বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প"এর আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। যে সব স্থানে বন্যপ্রাণীগুলি বেশি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান হলো ঢাকাস্থ কাঁটাবন, কাপ্তান বাজার, মিরপুর-১, ১৪, শাখারী বাজার, শাহজাহানপুর তথা ঢাকার ব্যস্ততম কিছু সড়কে (কাওরান বাজার, ধানমন্ডি, শাহবাগ, যাত্রাবাড়ী, শ্যামলী) ইত্যাদি । এ সকল স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীসহ বেশ কিছু আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করে। ফলে এ সকল স্থানে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে কমে গেছে। ঢাকার বাইরে বিশেষ করে টঙ্গি বাজার, সাভার, গাজীপুর, ভৈরব, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অত্র ইউনিট সমগ্র দেশে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত প্রদানসহ সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২০) মোট ৩১,১৯৭ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কার্যক্রম :

- অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, পাচার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় জনিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন ;
- অবৈধ বন্যপ্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে সমগ্র দেশে হটস্পট (Hotspot) চিহ্নিত করা এবং উক্ত পয়েন্টে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা ;

- অবৈধ বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য রোধকল্পে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর বাজার পরিদর্শণ ও অভিযান পরিচালনা করা ;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাগিদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আওতায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ;
- বন্যপ্রাণীর কালোবাজারী, চোরাচালানির পথ, অপরাধ প্রবণ এলাকা সনাক্ত করণ ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রোধকল্পে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ;
- বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন করে বন্যপ্রাণী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা ;
- আহত/অসুস্থ্য বন্যপ্রাণীর পরিচর্যা করা ;
- দলছুট হওয়া অথবা বিভিন্ন কারণে লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে সেগুলোকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল অথবা আবাসের উপযোগী বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা ;
- ফরেনসিক ল্যাবে জীনগতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেট্রফি/অবৈধভাবে বিক্রির নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর শরীরের অংশ ও নমুনা থেকে প্রজাতি চিহ্নিত করা এবং জীনগত সিকোয়েন্স এর মাধ্যমে DNA বার কোড ডেটাবেস তৈরি করা ।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

সাল	মোট অভিযানের সংখ্যা	উদ্ধার /জব্দকৃত বন্যপ্রাণির সংখ্যা				মোট মামলা সংখ্যা	ধৃত অপরাধির সংখ্যা
		পাখি	স্তন্যপায়ী	সরীসৃপ	ট্রফি		
২০১৯	১২৯	৩৭৯৬	৭৭	১৩১	২৯৮	৪৭	২৫ জন
২০১৮	২৪৭	২৩১০	৩৮	১৭	১৫	২৯	১৪ জন
২০১৭	১১২	২৪৫৫	১০	২০	-	০৪	০৫জন
২০১৬	১৮৫	৮১৮৯	২৯	২৪৮	৪০	৬৩	৩৪ জন
২০১৫	২৫৯	১৬৭৩	৩১	৬৬১৮	২৯৬	৫০	২৮ জন
২০১৪	২৪০	১২৫৭	২৩	৫৪৮	৩১৭	৪৭	৩০ জন
২০১৩	১৩৭	২২৪৩	৩২	৯২	০৩	৪৬	২৮ জন
২০১২	১৪১	৯৬১	১২	৪১০	২০৫	৪৬	৩৬ জন
মোট	১৪৫০	২২৮৮৪	২৪৭	৮০৬৬	১১৭৪	৩৩২	২০০ জন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের চিত্রঃ

২৪/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক গ্রীনভিউ রিসোর্ট এন্ড কনভেনশন সেন্টার, গোবিন্দপুর, মৈনারটেক, উত্তরখান থেকে ০৩টি বন্যপ্রাণীর চামড়া উদ্ধার করা হয়।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণীর আবাস্থল সংরক্ষণ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর সদর উপজেলায় মির্জাপুর-মাস্টার বাড়ীতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** ৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন,২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন।

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের মূল অবকাঠামো

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারের একাডেমিক ভবন

অবস্থান ও আয়তন:

ঢাকা বিভাগের অধীন গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের ১৮ নং আড়ইশ প্রসাদ মৌজায় বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারটি অবস্থিত। এটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরে ৭ কি.মি. দুরে মাস্টারবাড়ী নামক স্থানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে ঢাক-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে নির্মিত। এর মোট আয়তন ৬.৮৫ একর।

উদ্যেশ্য:

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা খাতের সকল পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও আগ্রহী দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলার নিমিত্তে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;

৩. দেশীয় বন্যপ্রাণী সম্পদ সমূহকে সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যা সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে উপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৪. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

৫. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে বন, বন্যপ্রাণী ও এর অবাসস্থল বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং সেন্টারকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সেক্টরের রেফরেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

৬. বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত মানসম্মত গবেষণা পরিচালনা ও দেশি, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিষেশজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

৭. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ;

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে SMART Patrolling বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মাঠ পরিদর্শনে সুন্দরবন ভ্রমণ

বাংলাদেশে প্রকৃতি পর্যটন

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এ বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এ প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং সিলেটের জলাভূমির বন পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া এবং আরো বিচিত্র রকমের মাছ। কুয়াকাটায় সাগর তীরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে। এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাড়া ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমুহের তালিকা নিম্নরূপঃ

বিছানাকান্দি

সাঙ্গু সংরক্ষিত বনাঞ্চল

কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধাগার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর), রাজেশপুর ইকোপার্ক (কুমিল্লা) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকা: রাতারগুল জলাভূমির বন, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, বিছানাকান্দি, হাকালুকী হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক, মহামায়া ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রাম পাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাথিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত, নীলাচল ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, টেংরাগিরি ইকোপার্ক, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, বানর, শুকর, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

প্রকৃতি পর্যটন উপভোগ করতে হলে পর্যটকদের কিছু নিয়ম কানুন পালনের নির্দেশিকা ঃ

কি কি কাজ করা উচিত	কি কি কাজ করা উচিত নয়
১) যে জায়গায় ভ্রমণে যাবেন সে জায়গার নিয়ম-কানুন মেনে চলা, যেমনঃ প্রবেশ ফি/পার্কিং ফি থাকলে ফি দিয়ে প্রবেশ করা।	১) বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণির ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ না করা।
২) নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলা।	২) যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলা।
৩) নির্দিষ্ট ট্রেইলে ভ্রমণ করা।	৩) রক্ষিত বনাঞ্চল, নদী, সাগর ও জলাশয়ে কোন ধরনের অপঁচনশীল দ্রব্যাদি না ফেলা।
৪) প্রয়োজনে ইকো-ট্যুর গাইড নিয়ে ভ্রমণ করা।	৪) উচ্চস্বরে মাইক ও হর্ণ না বাজানো।
৫) যে এলাকায় ভ্রমণ করা হয় এর আশেপাশের জনগণের মূল্যবোধকে সম্মান জানানো।	৫) হৈচৈ, চিৎকার- চেঁচামেচি না করা।

সাফারী পার্ক

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুসমূহ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং দর্শনার্থীগণ মুক্ত অবস্থায় থেকে জীবজন্তু পরিদর্শন করেন। কিন্তু সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে আবদ্ধ অবস্থায় জীবজন্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

সাফারী পার্কে দেশী-বিদেশী বন্যপ্রাণীসমূহ ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত অবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পাবে এবং উন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে। বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এবং মহাবিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কের ভিতরে (in-situ) এবং বাইরে (ex-situ) মুল আবাসস্থলে সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত ও দলছুট বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা প্রদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সাফারী পার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশে সাফারী পার্ক মোট ২টি।

১. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক**, কক্সবাজার
২. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক,** গাজীপুর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক বাংলাদেশের প্রথম সাফারী পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকোরিয়া উপজেলার ডুলাহাজরায় অবস্থিত। ১৯৮২ সালে ৪৩.০০ হেক্টর জমির উপর হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে ডুলাহাজরা ও হারগজা ব্লকের ৯০০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক প্রাতষ্ঠিত হয় এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছর হতে এ সাফারী পাকের্র উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। সাফারী পার্কটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত মননশীল ও সফল পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কে বেষ্টনীতে আবদ্ধ বন্যপ্রাণী সমূহ হলো স্তন্যপায়ী ১৩৬টি, পাখি ৯৫টি, সরীসৃপ ৯৭টি ইত্যাদি।

ডুলাহাজরা সাফারী পার্কের প্রবেশ দ্বার

ডুলাহাজরা সাফারী পার্কের হাতি

সাফারী পার্ক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দ্যেশ্যগুলো হলো-

১) প্রকৃতি হতে বিলুপ্ত, অতিবিপন্ন, বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর প্রজনন সুযোগ সৃষ্টি

২) বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা

৩) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও

৪) পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণীসমূহের প্রজননে সফলতা পাওয়া গেছে-

শ্রেণী	প্রজাতির নাম	বাচ্চার সংখ্যা	সংরক্ষণ অবস্থা
স্তন্যপায়ী	কালো ভাল্লুক	৪	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	২	অতিবিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
	সিংহ	৭	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	জলহস্তি	৬	বিপদাপন্ন (আই.ইউ.সি.এন)
	ওয়াইল্ড বিষ্ট	৫	কম ঝুঁকিপূর্ণ (আই.ইউ.সি.এন)
পাখি	ময়ূর	৫	বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)
সরীসৃপ	লোনা পানির কুমির	২০	বিপন্ন (আই.ইউ.সি.এন রেড লিস্ট, বি.ডি.-২০১৫)

সাফারী পার্ক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি আর্দশ গবেষণা ক্ষেত্র। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার কাজে অত্র পার্কে আসেন। সারাদেশের স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার একটি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে আসেন। শিক্ষা সফরে আগত প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে ১জন দক্ষ কর্মকর্তার নেতৃত্বে পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারি,তথ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র,বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম এবং প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের পাশাপাশি পার্কটিকে দর্শনার্থীদের কাছে আরো আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পরামর্শক এর সহযোগীতায় একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মাষ্টারপ্ল্যান প্রনয়ন করা হয়। অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান এর আলোকে এবং আধুনিক সাফারী পার্ক তৈরীর ধ্যান ধারনাকে সামনে রেখে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প" নামে নতুন একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টির আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

ঢাকা থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘের বাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে সাফারী পার্কটির অবস্থান। ভাওয়াল গড়ের শালবন একসময় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী ও গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নের

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের প্রবেশ দ্বার

পিরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বনভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৮৬০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১১ সালে কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে শেষ হয়। সাফারী পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারী ওয়ার্ল্ড (Safari World) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। সাফারী পার্কের চারদিকে নির্মান করা হয়েছে স্থায়ী ঘেরা এবং উহার মধ্যে দেশী/বিদেশী বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধি ও অবাধ বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে পর্যটকগণ চলমান যানবাহনে অথবা পায়ে হেঁটে ভ্রমন করে শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করতে পারবেন।

সাফারী পার্কের মূল উদ্দেশ্য

১। শাল বনের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

২। বাংলাদেশের বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীকে নিজ আবাসস্থলে (in-situ) এবং আবাসস্থলের বাহিরে (ex-situ) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;

৩। ঢাকা মহানগরীর অতি নিকটে ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪। শালবনের বন্যপ্রাণী যেমন বানর, মায়া হরিণ, বেজী, বনরুই, বাঘদাস, বন বিড়াল, খরগোশ, শিয়াল, খেকশিয়াল ও অজগরসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি ও সংরক্ষন করা;

৫। এছাড়া বাঘ, সিংহ, সাম্বার হরিণ, মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, প্যারা হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬। গন্ডার, এশীয় হাতী, পারিযায়ী পাখী, জলজ পাখী, কালো ভাল্লুক, মিঠা পানির কুমির, লোনা পানির কুমির, নীল গাই, জলহস্তী ইত্যাদি বিপন্ন ও বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ;

৭। আহত ও উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার নিমিত্তে বন্যপ্রাণীর সেবাশ্রম ও হাসপাতাল স্থাপন;

৮। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সাফারী পার্কে দর্শনীয় স্থান ও বেষ্টনী

১। কোর সাফারী পার্ক (Core Safari Park)

২। বাঘ সাফারী

৩। আফ্রিকান সাফারী

৪। সাদা সিংহ সাফারী

৫। সিংহ সাফারী

৬। হরিণ সাফারী

৭। প্রজাপতি গার্ডেন

৮। ফেন্সি কার্প গার্ডেন

৯। ন্যাচারহিস্ট্রি মিউজিয়াম

১০। ফোয়ারা
১১। তথ্য ও শিক্ষা কেন্দ্র
১২। ঝুলন্ত সেতু
১৩। ম্যাকাউ ল্যান্ড
১৪। 3-D Show
১৫। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার
১৬। সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
১৭। বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরা
১৮। কচ্ছপ ও কাছিম ব্রিডিং সেন্টার
১৯। লিজার্ড পার্ক
২০। ফেন্সি ডার্ক গার্ডেন
২১। ইকো রিসোর্ট
২২। ক্রাউন ফিজেন্ট পাখীশালা
২৩। ধনেশ পাখীশালা
২৪। টিয়া/তোতা পাখীশালা
২৫। কুমির বেস্টনী
২৬। পাখি দ্বীপ
২৭। অর্কিড হাউজ
২৮। শকুন পূনর্বাসন কেন্দ্র
২৯। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র
৩০। শিশু পার্ক ইত্যাদি

জলবায়ু পরিবর্তন-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারনে বাংলাদেশ জলবায়ূ পরিবর্তনের শিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম দেশ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে নগরায়ন, শিল্পবিপ্লব,নির্বিচারে বন নিধন ইত্যাদি অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপ্তি, প্রকোপ ও আবর্তকালের পরিবর্তন জনপদকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। সে সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুনমাত্রা; যেমন- জলাবদ্ধতা, মরুময়তা,উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৮ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি। বাংলাদেশ আজ ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশকে এ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী করা না গেলেও এ দেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাবের নির্মম শিকার। সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপগ্রহণ করেছে; যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্প্রচার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, উপকূলীয় বাঁধ তৈরী,বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি। কিন্তু নতুন মাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগএবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে আরও প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রয়াস। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখতে ও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ১৯৯২ সনে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘের কাঠামোগত কনভেনশন UNFCCC এবং এর আওতায় প্রণীত কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল ও পরিবর্তিত অর্থনীতির দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিলেও তা খুব একটা আশানুরূপভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। তাই উন্নয়নশীল দেশ ও পরিবর্তিত অর্থনীতির দেশসমূহ উন্নত দেশসমুহের সহায়তার আশ্বাসকে আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যেই এ ধরনের আইনী কাঠামো গঠন করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ আশা প্রকাশ করেছেন। BCCSAP প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ রোধে উপকূলে জেগে ওঠা চর বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের লক্ষ্যে ৫১২ কি.মি. এলাকাজুড়ে আগামী ৫ বছরে প্রস্তাবিত “Coastal Afforestation in Newly Accreted Chars of Bay of Bengal” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৫০০০ হেঃ ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

বন সেক্টরে সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি

পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, গ্রাম বাংলার দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নে গাছের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। জলবায়ুর তারতম্যের কারণে এ দেশে গাছগাছালীতে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে; যেমন-পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, শাল বন, জলাভূমির বন ও সৃজিত উপকূলীয় বন। দেশের মোট আয়তনের ১৭.৬২ শতাংশ এলাকায় বনভূমি রয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় আছে বসত ভিটার বন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬-২০২০ মেয়াদে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমান ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীন এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৯-২০ আর্থিক সালে বন অধিদপ্তর-এর আওতায় বাস্তবায়িত এডিপিভূক্ত ১৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ১৪টি উন্নায়ন প্রকল্প চলমান আছে। ২০১৯-২০ আর্থিক সালের উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ জিওবি ৭৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ১৬৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প তালিকা

বিনিয়োগ প্রকল্পঃ

১. বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)

৩. বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)

৪. বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)

৫. শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)

৬. বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)

৭. স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)

৮. প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)

৯. Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)

১০. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তুসংস্তান সংরক্ষণসহ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)

১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)

১২. কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগের পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)

১৪. মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)

১৫. মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)

কারিগরী প্রকল্পঃ

১. Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes in Bangladesh Project (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)

২. Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West Region Bangladesh to Conserve outstanding Universal values of the Sundarbans Project (অক্টোবর, ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১)

৩. Expanding the Protected Area System to Incorporate Important Aquatic Ecosystems Project (July, 2016 to June, 2020)

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্পঃ

১. জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) সংশোধন ও পরিমার্জন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর বর্ধিতাংশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (আগস্ট, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)।

৩. কুকরী-মুকরী ইকোপার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)।

৪. মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সৌর বেষ্টনী স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত)।

৫. শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্পের এর আওতায় বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণ প্রকল্প ((আগস্ট, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)।

৬. সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ইকোপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)।

৭. রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিবর্ষন জনিত ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা সমূহ মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)।

৯. চরফ্যাশন রেঞ্জের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)।

১০. খুলনা জেলায় শেখ রাসেল ইকো পার্ক স্থাপন প্রকল্প (জুন, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

১১. সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত)।

১২. সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কাজিপুর উপজেলায় সমন্বিত বনায়নের মাধ্যমে যমুনা নদীর চরাঞ্চল ও নাটুয়ার পাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত)।

১৩. সুন্দরবনে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোীদত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত)।

১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত)।

বাংলাদেশ ফরেস্ট ইনভেন্টরী

পটভুমিঃ

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "Strengthening National forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in support of REDD+ in Bangladesh" প্রকল্পটি জুন ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। USAID এর আর্থিক সহযোগিতায় ও FAO এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে যে প্রধান তিনটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা নীচে দেয়া হলঃ

১। Satellite Image Interpretation এর মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫ (Land Cover Map 2015) প্রস্তুত করণ।

২। সারা দেশে বন এলাকার ভিতরে এবং বাহিরে গৃহীত নমুনা প্লট এ Bio-physical measurement (গাছের সংখ্যা, উচ্চতা, বেড়, চারার সংখ্যা প্রভৃতি এবং মাটির নমুনা সংগ্রহ) এর মাধ্যমে Timber volume, biomass, carbon এর পরিমাণ নির্ণয়।

৩। Socio-economic survey এর মাধ্যমে বৃক্ষ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা নির্ণয়।

উল্লেখিত তিনটি কাজকে একত্রে Bangladesh Forest Inventory (BFI) বলা হচ্ছে। এটি একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে দেশের বৃক্ষ, বন ও বনজ সম্পদের একটি ভিত্তি আমরা পেয়েছি যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মনিটরিং করা সম্ভব হবে।

১ নং কাজটি অর্থাৎ Satellite Image Interpretation এর মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫ (Land Cover Map 2015) সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

Bangladesh Forest Inventory এর উদ্দেশ্যঃ

১। দেশের বন আচ্ছাদন নিরূপণ;

২। দেশের বন এলাকা ও বন এলাকার বাইরের বৃক্ষ সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়;

৩। মাটির উপরের ও মাটির নীচের কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়;

৪। বৃক্ষ সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা পরিমাপ ও এর অর্থনৈতিক মুল্যায়ন;

৫। জাতীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে [যেমন- SDG, 8th five year plan, Forest Resource Assessment (FRA), Forest Reference Level (FRL) etc.] তথ্য উপাত্ত সরবরাহকরণ ইত্যাদি।

১। Satellite Image Interpretation এর মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০১৫।

Satellite Image Interpretation এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মানচিত্রে ৩৩ টি ভূমি ব্যবহার (Land cover) শ্রেনি সনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ টি শ্রেনি বন আচ্ছাদনের অন্তর্ভুক্ত। বন শ্রেণি সমুহের অধিকাংশই সরকার ঘোষিত বন ভুমির মধ্যে অবস্থিত।

এ মানচিত্র অনুযায়ী দেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত বন এলাকার (Forest Cover) পরিমানঃ ১২.৮%.

Sl	Forest Class	Area (Km2)	%
1	Hill Forest	6,839	4.634
2	Bamboo Forest	57	0.039
3	Plain Land Forest (Sal Forest)	189	0.128
4	Shrubs with scattered trees	6,145	4.164
5	Swamp Forest	1	0.001
6	Rubber Plantation	237	0.160
7	Forest Plantation	793	0.537
8	Mangrove Forest	4,022	2.725
9	Mangrove Plantation	551	0.373
10	Swamp Plantation	6	0.004
	Total Forest	**18,840**	**12.767**

২। সারা দেশে বন এলাকার ভিতরে এবং বাহিরে গৃহীত নমুনা প্লট এ Bio-physical measurement

সারা দেশের জন্য মোট ১৮৫৮ টি নমুনা প্লট থেকে তথ্য সংগ্রহের ডিজাইন চূড়ান্ত হয়। United States Forest Service (USFS), FAO এবং বন অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে inventory design চূড়ান্ত করে। ডাটা সংগ্রহের জন্য ১২ টি ফিল্ড টিম ও ৪ টি কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম গঠন করা হয়। USFS এর অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এ সকল টিমের সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান করেন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন মন্ত্রী মহোদয় নমুনা প্লট থেকে ডাটা সংগ্রহের কাজ উদ্বধন করেন। পরিকল্পনা ছিল ২০১৮ সালের ডিসেম্বর এর মধ্যে ডাটা সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করা। সে অনুযায়ী সকল এলাকার কাজ সমাপ্ত হয় কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির কারণে সেখানে সমাপ্ত করা যায়নি। বিশেষ টিম গঠন করে পার্বত্য এলাকায় কাজ শুরু করে এপ্রিল ২০১৯ এ কাজ সমাপ্ত করা হয়। ১৮৮১ টি নমুনা পটের মধ্যে ১৭৮১ টি পটে পৌঁছে (৯৬%) ডাটা সংগ্রহ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ জরিপে কোন কাগজের ফর্ম ব্যবহার করা হয়নি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে।

FAO এর পরামর্শকগন ও বন অধিদপ্তরের RIMS unit এর কর্মকর্তাগণ সংগ্রহীত ডাটা যাচাই-বাছাই, প্রসেস ও এনালাইসিস কাজ শুরু করে। অক্টোবর ২০১৯ এ প্রথম খসড়া রিপোর্ট তৈরি হয়। Inventory কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালাতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে রিপোর্ট টি সমৃদ্ধ করা হয়। একই সময়ে এবং এর পর প্রধান বন সংরক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রাপ্ত রিপোর্ট টি শেয়ার করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত মতামত সমুহ সন্নিবেশ করতঃ এপ্রিল ২০২০ এ খসড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

Bio-physical measurement প্রাপ্ত উল্লেখ যোগ্য ফলাফল সুমহঃ

- নমুনা পট সমুহের মধ্যে ৩৯০ টি বৃক্ষ প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ৯% introduced species.
- সারা দেশের বন ও বনের বাহিরে বৃক্ষ সম্পদের National growing stock- ৩৮৪মিলিয়ন ঘন মিটার;
- National growing stock এর ৬৬% বন এলাকার বাহিরে অবস্থিত বৃক্ষ সম্পদ থেকে;

Zone	Volume (m^3/ha)	Total volume (million m^3)
Coastal	50.08	25.55
Hill	47.69	79.12
Sal	34.17	17.84
Sundarban	97.75	39.44
Village	21.44	221.98
National	28.54	383.92

- বৃক্ষের মাটির উপেরর অংশে জমাকৃত Biomass এর পরিমান- ৩৮৭ মিলিয়ন টন;
- প্রধান তিনটি Biomass উৎপাদন কারী বৃক্ষ প্রজাতি- ১। আম ২। সুন্দরি ও ৩। মেহগনি।
- দেশের মাটির উপরের বৃক্ষ সম্পদ, মাটির নিচের বৃক্ষ সম্পদ এবং মাটির মধ্যে (৩০সেন্টি মিটার গভিরতা পর্যন্ত) সঞ্চিত কার্বনের পরিমান- ১২৭৬ মিলিয়ন টন।
- ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ২২% বনাঞ্চলের মধ্যে, বাকিটা বন এলাকার বাহিরে অবস্থিত;
- ১২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ১০% পাহাড়ি বনে এবং প্রায় ৫.৫% সুন্দরবনে অবস্থিত;

৩। Socio-economic survey এর মাধ্যমে বৃক্ষ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা নির্ণয়।
নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে সারা দেশের ৬৪০০ টি household থেকে ডাটা সংগ্রহ করে এ জরীপ সম্পন্ন করা হয়। এ কাজেও কোন কাগজের ফর্ম ব্যবহার করা হয়নি। বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ থেকে মানুষ কি উপকার পেয়ে থাকে, এর অর্থনৈতিক মুল্য সম্পর্কে ধারনা, জাতীয় অর্থনীতিতে বৃক্ষ ও বনজ সম্পদের অবদান প্রভৃতি বিষয়ক ধারণা এ জরিপের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে।

প্রাপ্ত কিছু উল্লেখ যোগ্য ফলাফলঃ

- দেশের বৃক্ষ সম্পদ Gross National Income (GNI) এর ১.২৯ % অর্জনে অবদান রাখছে;
- সংগৃহীত বৃক্ষ সম্পদ এর অর্থনৈতিক মুল্য ২০১৭-১৮ সালের Gross Domestic Product (GDP) এর ৩.১১%;
- জরিপে তথ্য প্রদান কারী পরিবার সমুহ কমপক্ষে একটি উপকার বৃক্ষ সম্পদ থেকে পেয়েছে;
- বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ সামগ্রী সংগ্রহকারীদের প্রায় ৬৫% মহিলা;
- ৫৪% পরিবার বৃক্ষ ও বন থেকে ঔষধি উপকার পেয়েছে;
- সুন্দরবনের পাশে অবস্থানকারী পরিবার সমুহ অন্যান্য এলাকা থেকে অধিক আয় করে, যার অর্ধেকেরও বেশি আসে মাছ ও কাঁকড়া থেকে।

BFI থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যবহারঃ

- এসডিজি ১৫ এর ৬ টি ইনডিকেটর এর বেজ লাইন ও মনিটরিং তথ্য;
- Global Forest Resource Assessment (GFRA) ২০২০, বাংলাদেশের প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রদান;

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ বাংলাদেশ প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ;
- UNESCO World Heritage Site এ প্রেরনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে সুন্দরবনের কার্বনের পরিমান ও বন এলাকার তথ্য প্রদান;
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র ২০০০-২০১৫ এর ডাটা থেকে বনায়ন যোগ্য এলাকা নিরুপন।

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা এবং সরকারি অনুদানে মোট ১৫০,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বছর (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) মেয়াদে Sustainable Forests & Livelihoods (SUFAL) Project বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মোট চারটি অঙ্গের আওতায় এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ।

২। সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন।

৩। প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।

৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সরকারি বন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিসহ অবক্ষয়িত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় বনায়ন, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। অধিকন্তু, বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম ও জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (Collaborative Forest Management) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শক্তিশালী করা হবে। ইতোমধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত টেবিলে প্রকাশিত হলো।

টেবিলঃ ২০১৯-২০২০ সনে বনায়নের অগ্রগতি

বনায়ন	একক	এলাকা	চারার সংখ্যা (লক্ষ)
বিভিন্ন প্রকার বনায়ন	হেক্টর	১৩,১৭০.০০	২৬৩.৭২
উপকূলীয় বনায়ন	হেক্টর	৪,৪৬০.০০	১৫৮.৪৪
স্ট্রিপ বনায়ন	চারা কিলোমিটার	১,৮৪১.০০	১৮.৪১
বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন (মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বিতরণের ৩৩.৫ লক্ষ চারা সহ)	সংখ্যা	-	৪৮.৬৯
	মোটঃ		**৪৮৯.২৬**

নার্সারীতে দেশীয় প্রজাতির উত্তোলিত চারা

অস্থায়ী নার্সারী

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পে প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার বনায়নের মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ করার সংস্থান রয়েছে, যার প্রায় ১৮,৯৬০ হেক্টর বনায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। আরও ৮,৫৫০ হেক্টর বনায়নের চারা নার্সারীতে উত্তোলিত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী ১,২৩৬ জন বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৭৭৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে, বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা সমুন্নত হচ্ছে।

ম্যানগ্রোভ নার্সারী

এসএসপি প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম-পর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের বন বিট সমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি বন বিভাগের ৩৩০ টি বন বিটের আওতাধীন প্রায় ৬০০ টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তাদের বিকল্প জীবিকার সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম এর সাথে সাথে প্রতিটি (সহযোগীতামূলক) গ্রাম-সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে, বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র - বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিসহ সাধারণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, অত্র প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা (PA Co-Management) পদ্ধতি সম্প্রসারণসহ আরো ১৬টি রক্ষিত

এলাকায় বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখিত কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পে ৭টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার (NGO) সংযুক্তির সংস্থান হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রাম জরীপ, কমিউনিটি প্রোফাইলিং, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার প্রশিক্ষণ প্রদান, মনিটরিং এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনভূমি সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে; ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেও বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (Sustainable Development Goals) এর বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন সংরক্ষন, রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সহ বেশকিছু উন্নয়ন সুচকে অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
১	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
২	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
৩	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
৪	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	১৪৬
৫	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	২৪.১৭
৬	নাগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	পাবনা	৪০৮.১১
৭	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
৮	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
৯	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৬৮
		মোট	৫০৭৫.২৮

২। ডলফিনের গবেষণার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন পান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

গাঙ্গেয় ডলফিন (শুশুক)

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই) তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%, যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

USAID এর আর্থিক সহায়তায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১লা ডিসেম্বর, ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪ শে এপ্রিল, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রলালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায়। SERC মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫+০.৩২। সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিঃ মিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ)।

২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সে হিসাব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।

ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বন অধিদপ্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী পূর্বক যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মূখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শণার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের

জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনগণকে প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং জনবান্ধব করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ফ্রন্টডেস্ক গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদেরকে অনলাইন চেক প্রদান করা হচ্ছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উত্তোলিত নার্সারী ও সৃজিত বাগান পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের কাযর্ক্রম চলমান রয়েছে।

সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে মতবিনিময় সভা

বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে "ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাউজ সমূহের অনলাইনে বুকিং" এ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান আছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সুন্দরবন পূর্ব ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক সুন্দরবনের ভিতর অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরনের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্ক সংরক্ষণের জন্য সার্কের অবৈধ পাচারের স্থান নির্নয়ের জন্য

তৈরীকৃত এ্যাপস চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্কের অবৈধ পাচার রোধ করে সার্কের সংরক্ষণসহ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ৫ম অবস্থানে উঠে এসেছে (তথ্য সূত্রঃ জুলাই ২০২০ মাসের প্রতিবেদন)। চলতি অর্থ বছরে সদর দপ্তরের ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পাবে।

বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতাভূক্ত করার কার্যক্রম চলছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটা বিশেষ অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কারঃ

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে ঃ

১। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন

আন্তর্জাতিক পুরস্কারঃ

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে ; যথাঃ

i) UN declared Equitor Award 2012
ii) Wangiri Mathai Award 2012
iii) JSW Earth Care Award 2012
iv) Solution Search 2013
v) HSBC-Daily Star Climate Award
vi) People's Choice Award (The Conservance & RARE, USA)
vii) Champion of the earth 2015

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার

প্রদান করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদসহ একাউন্ট পেয়ী চেকে পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৯ শুভ উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/ সংস্থাকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এ পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation নীতিমালা" প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান- এর বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরষ্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক, সনদপত্র ও অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

ক্যাটাগরিসমূহঃ

ক. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ ব্যক্তিত্ব;

খ. বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা এবং

গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

সর্বশেষ ২০১৯ সালে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
১।	বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব	তানিয়া খান (মরণোত্তর) প্রতিষ্ঠাতা, সোল (সেভ আওয়ার আনপ্রোটেক্টেড লাইফ), মৌলভীবাজার।
২।	বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা	বেনজীর আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৩।	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান	হাল্লা পাখিবাড়ি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি গ্রাম: হাল্লা, উপজেলা: বড়লেখা জেলা: মৌলভীবাজার। সভাপতি: বিদ্যুৎ কান্ত দাস প্রতিষ্ঠাতা: শাহরিয়ার আহমদ স্বপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন জনাব বেনজীর আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। দিবসগুলো উদ্‌যাপন উপলক্ষে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলির তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। নিম্নে বন বিভাগে সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হল:

আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১শে মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "বন ও জীববৈচিত্র্য মূল্যবান অতি, হারালে অপূরণীয় ক্ষতি"। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আড়ম্বরভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি সভার আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২০

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষনা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এই উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন,এম.পি। এই বছরে বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Sustaining all Life on Earth", যার ভাবার্থ করা হয়েছে "পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য প্রাণীকূল বাঁচাই"।

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২০

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি সভার আয়োজন করে। এবছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল -

প্রজন্ম হোক সমতার
সকল নারীর অধিকার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০

বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দিবস ঃ

১. বিশ্ব জলাভুমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারি।
২. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৩. বিশ্ব পানি দিবস: ২২ মার্চ।
৪. বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস: ১৮ এপ্রিল।
৫. ধরিত্রী দিবস: ২২ এপ্রিল।
৬. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৮. বিশ্ব সমুদ্র দিবস: ৮ জুন।
৯. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১০. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১১. আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস: সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার।
১২. আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস: ১৬ সেপ্টেম্বর।
১৩. বিশ্ব নদী দিবস: ২৮ সেপ্টেম্বর।
১৪. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস: ৪ ডিসেম্বর।
১৫. বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস: ৩ মার্চ।
১৬. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
১৭. বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস: ১০ অক্টোবর।
১৮. আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস: ২৪ অক্টোবর।
১৯. আন্তর্জাতিক কাছিম দিবস: ২৩ মে।

সংরক্ষিত বনভূমিতে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক কর্তৃক বসতি স্থাপন, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের তথ্যাদি

মায়ানমার এর রাখাইন প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য সেখানকার নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। পরবর্তীতে তাদেরকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফ উপজেলার নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পে পুনর্বাসন করা হয়। এর বাইরে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী ক্যাম্পেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বসতি স্থাপন করে। উক্ত ক্যাম্পগুলি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে অবস্থিত। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শেষের দিকে পুনরায় তারা ব্যাপকহারে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে । উক্ত জনগোষ্ঠি বনভূমিতে বসতি স্থাপন করার ফলে একদিকে যেমন বনভূমি জবরদখল হয়, অন্যদিকে তাদের জীবিকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় বনভূমির গাছ কর্তন ও পাচারে লিপ্ত হয়। শরণার্থী ক্যাম্প ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকান্ড ছাড়াও বন ও পরিবেশের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম ক্ষতিকর দিকগুলো হলো- বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে বনভূমি হতে ব্যাপকভাবে জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কর্তন ও মাটি বিক্রি, অবৈধভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য পাচার, বনভূমি জবরদখলসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রভাবশালী/কুচক্রিমহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধভাবে গাছ কর্তন ও পাচার কাজে শ্রমিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, রোহিঙ্গাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় গণস্বাস্থ্য, পয়:নিষ্কাশন, সামাজিক কর্মকান্ড, গণযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতদ্ব্যতীত সঠিক নাম ঠিকানার অভাবে রোহিঙ্গাদের দ্বারা অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার পরও অপরাধীকে যথাযথভাবে সনাক্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরূহ হয়ে পড়ে।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে পুনরায় সহিংসতার কারণে গত ২৫ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ব্যাপকহারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি সীমান্ত অতিক্রম করে এবং প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা (নিবন্ধনকৃত আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা ১১,১৮,৫৭৬ জন) জনগোষ্ঠি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এক সাথে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অনুপ্রবেশ করে বনভূমিতে বসতি স্থাপনকালে সীমিত জনবল নিয়ে উহা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। উখিয়া উপজেলার কুতুপালং, বালুখালী, বালুখালী ঢালা/ময়নারঘোনা, তাজনিমা খোলা, মক্করার বিল/হাকিমপাড়া, জামতলী বাঘঘোনা, শফিউল্লা কাটা এবং টেকনাফ উপজেলার পুটিবুনিয়া, ঊনচিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন, শামলাপুর ও কেরনতলী এলাকায় বন বিভাগের গেজেটভূক্ত বনভূমিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং বন ও বনজসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিদের আবাস স্থলে মোট ৩৪টি ক্যাম্প (উখিয়া-২৬টি ও টেকনাফ-৮টি ক্যাম্প/২টি পুরাতন ও ৩২টি নতুন ক্যাম্প) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের ৬,১৬৪.০২ একর বনভূমিতে বসতি স্থাপনের ফলে ২,০২৭.৫০ একর বনভূমির সৃজিত বন (প্রধানতঃ সামাজিক বনায়ন) এবং ৪,১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যায়। সৃজিত বনের ক্ষেত্রে

বনজসম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭,৯৬,৯১,৯৭৫.৭৮ টাকা। ৪,১৩৬.৫২ একর প্রাকৃতিক বন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিবিধ প্রজাতির গাছ, লতা, গুল্ম, সানগ্রাস, উলুফুল, বাঁশ, বেত, ঔষধি গাছসহ অন্যান্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ ছিল। প্রাকৃতিক বনের আনুমানিক ক্ষতি ২৫৮,১১,১১,৬৬৪.৮২। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০.৬০ টাকা।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করার ফলে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে উহা নিরূপন করা বাঞ্ছনীয়। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির জন্য গত সেপ্টেম্বর/২০১৬ খ্রিঃ মাসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা হয়েছিল। একই জেলায় প্রায় একই ভূ-প্রকৃতির অংশ হওয়ায় Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতির অনুরূপ হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত ৬,১৬৪.০২ একর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমির জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ১৪,০৯,৪৮,৫৪,১৯৫.১৯ টাকা (কম/বেশি)। অর্থাৎ বনজদ্রব্য ও জীববৈচিত্র্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৬৫,৫৬,৫৭,৮৩৫/৭৯ (বনজদ্রব্য ৪৫৬,০৮,০৩,৬৪০/৬০ + জীববৈচিত্র্য ১৪,০৯,৪৮,৫৪,১৯৫/১৯ টাকা)। তবে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপনের জন্য অত্র বন বিভাগের প্রস্তাবের আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বন ভূমি ধ্বংস করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক বসতি স্থাপন

রোহিঙ্গা কর্তৃক দখলকৃত বনভূমির পরিমাপের জন্য দখলকৃত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে সীমানা বরাবর বিভিন্ন স্থানে জি.পি.এস (GPS) waypoing (Latitude & Longitude) গ্রহণ করে Computer Software এর মাধ্যমে মোট পরিমাপ হিসাব করা হয়েছে, যাতে বাস্তবের সাথে পরিমাপের সঠিকতার (Accuracy) কিছুটা তারতম্য হতে পারে। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন

কমিশনার, কক্সবাজার এর দপ্তরের ০৭ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদনে উক্ত পরিমাণ ৬,৫০০ একর হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, ভাসানচরে স্থানান্তর এবং ক্যাম্প এলাকায় সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ২৯ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্পষ্টীকরণে উল্লেখ করা হয় যে, ১. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য ভাসানচরে সকল সুবিধাদির সমন্বয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিধায় কক্সবাজার জেলায় আর কোন ভূমি বরাদ্দ দেয়া যাবে না। ২. কক্সবাজার জেলায় বরাদ্দকৃত ৮,০০০ একর জমির বাইরে অতিরিক্ত কোন জমিতে রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। ৩. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর তত্ত্বাবধান করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৬/০৯/১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ০৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যাতিত অন্যত্র রোহিঙ্গাদের অবস্থানের সুযোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি উল্লেখ করে নতুন করে স্থাপনা নির্মাণ না করতে এবং বসতি স্থাপনের জন্য নতুন করে কোন বনভূমি ব্যবহার না করতে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজারকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ক্যাম্প এলাকায় চলাচলের জন্য রাস্তা, ল্যাট্রিন, নলকূপ, গুদামঘর/ওয়ারহাউজ ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে। বন বিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে স্থাপনা তৈরী করা হলেও উক্ত বিষয়ে বন বিভাগকে অবহিত করা হচ্ছে না। শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার কর্তৃক মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান কাজের হালনাগাদ অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী বিষয়ে ০৭ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য এ পর্যন্ত ৩৪টি ক্যাম্প ও ২৮টি সিআইসি অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ২,১২,৬০৭ টি ঘর (অস্থায়ী শেল্টার), ৯,৬৩৯টি নলকূল, ৫৭,৩৬৩টি ল্যাট্রিন, ১৮,৫২২টি গোসলখানা, ২০ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন, ৩৪.৬০ কিঃ মিঃ সংযোগ সড়ক , ত্রাণ সংরক্ষণের জন্য ২০ টি অস্থায়ী গুদাম, ৩০ কিঃ মিঃ খাল খনন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থাপনার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্থাপনাসমূহ নির্মাণের জন্য IOM, UNHCR সহ বিভিন্ন এনজিও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকহারে পাহাড় কর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া, ক্যাম্প এলাকার বনভূমির পাহাড় কর্তন করে পুলিশ ক্যাম্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অফিসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা হচ্ছে।

কক্সবাজার জেলার বনভূমি Critically Endangered এশিয়ান হাতির বাসস্থান, বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র। IUCN (International Union for Conservation of Nature) এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক এ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় ৬৩টি এশিয়ান হাতি বাস করে। সেগুলো মূলতঃ উখিয়া টেকনাফ এবং রামু (আংশিক) উপজেলার বনভূমিতে বসবাস করলেও পানেরছড়া-রাজারকূল এবং বালুখালী-ঘুনধুম করিডোর দিয়ে সেগুলি এ জেলা হতে বান্দরবান ও মায়ানমারে চলাচল করত। রামু ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের ফলে পূর্বেই পানেরছড়া-রাজারকূল

করিডোরটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৭ সালে মায়ানমার হতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি আগমন করতঃ বসতি স্থাপনের ফলে বালুখালী-ধুমধুম (নাইক্ষ্যংছড়ি-কুতুপালং-ঘুনধুম-তামরু-আজুহায়া হতে মধুরছড়া-বতলীঘোনা-বালুখালী-পালংখালী-সোয়ানখালী এলাকায় ব্যাপৃত যার দৈর্ঘ্য ৪.৩৫ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ ১.১৩ কিঃ মিঃ) করিডোরটি সর্ম্পূণ বন্ধ হয়ে যায়। যাতে Elephant-Human Conflict বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে হাতির আক্রমনে অন্ততঃ ১২জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বনভূমিতে পরিকল্পনাহীন বসতি স্থাপন এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নির্বিচারে গাছ ও পাহাড় কর্তন করে আবাসস্থল ধ্বংস করায় অদুর ভবিষ্যতে হাতি খাদ্য সংকটে পতিত হবে এবং প্রজননও ব্যাহত হবে। ফলে ভবিষ্যতে হাতি - মানুষ সংঘাত ও উভয়ের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

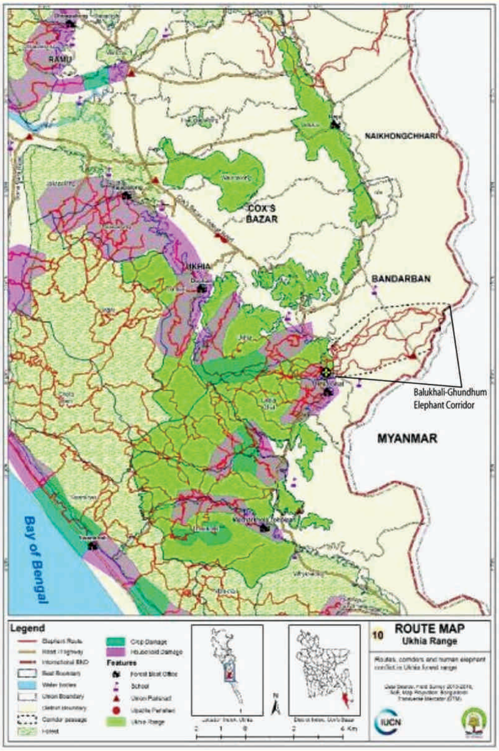

রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে বন্ধ হওয়া বন্যহাতির করিডোর

বাংলাদেশে অবস্থানকারী এ সকল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হলেও রান্নার জন্য কোন জ্বালানীর ব্যবস্থা করা হয়নি। জ্বালানীর ব্যবস্থা না করায় জ্বালানী কাঠের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাহিরে এ বন বিভাগের ১৮৩৭.০ একর (সৃজিত বন প্রধানত সামাজিক বনায়ন ৫৮০.০ একর ও প্রাকৃতিক বন ১২৫৭.০ একর) বাগানে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে গাছ কর্তন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছ কর্তনের সাথে সাথে শিকড়ও উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। সৃজিত বনের ক্ষেত্রে বনজসম্পদের আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৬,৬৩,২৩,৬০০/- টাকা ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে আনুমানিক ক্ষতি ৭৮,৪২,১৮,৪১৭/- টাকা, মোট ক্ষতি ১৩৫,০৫,৪২,০১৭/- টাকা। Single Point Mooring (SPM) প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতির অনুরূপ হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি দ্বারা জ্বালানী কাঠের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত ১৮৩৭.০ একর রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমির জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪২০,০৫,৪৫,৬১০.৮৭ টাকা (কম/বেশি)। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কারণে বনজদ্রব্য ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৫,১০,৮৭,৬২৭.৮৭ টাকা। অর্থাৎ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক এ বন বিভাগের সংরক্ষিত/রক্ষিত বনভূমিতে বসতি স্থাপনের কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত (৬,১৬৪.০২ একর) ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত (১৮৩৭.০ একর) বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২০,৬৭,৪৫,৪৬৩.৫০ টাকা (বনজদ্রব্য ৫৯১,১৩,৪৫,৬৫৭.৬০+জীববৈচিত্র্য ১৮২৯,৫৩,৯৯,৮০৫.৯০)।

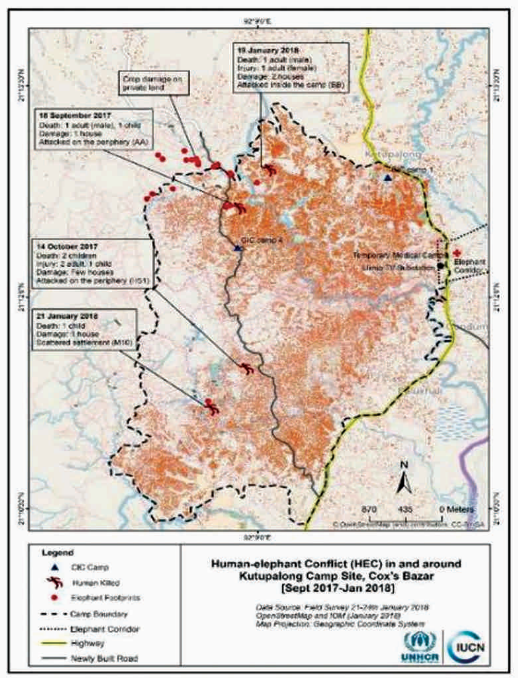

মানুষ - হাতি দ্বন্দ্ব

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে ২,১২,৬০০ পরিবারকে (Host Community সহ) বিকল্প জ্বালানী হিসেবে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে (রোহিঙ্গা পরিবার ১,৯২,৫৪৭ এবং হোষ্ট কমিউনিটি পরিবার ২০,০৫৩)। এছাড়া, কিছু কিছু স্থানে সীমিত সংখ্যক বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন করা হলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে, সমস্ত রোহিঙ্গা ও ক্যাম্প সন্নিহিত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে বিকল্প জ্বালানী সরবরাহের সাথে সাথে দ্রুত বৃক্ষশূণ্য এলাকায় বনায়ন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশী বিদেশি এনজিও কর্তৃক ক্যাম্পসমূহে বিগত ২০১৮ সালের বর্ষা

মৌসুমে ২,০৪,৩০০টি ও ২০১৯ সালের বর্ষা মৌসুমে ৫,০০,০০০টি বিবিধ প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়েছে এবং চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে আরও ২,৫০,০০০টি বিবিধ প্রজাতির চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কক্সবাজার জেলার পাহাড়গুলো প্রধানতঃ Laterite and sandy ধরনের হওয়ায় মাটির কাঠিন্য/দৃঢ়তা খুবই কম। ফলে একটানা বেশি দিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে পাহাড় ধ্বসের সৃষ্টি হয়। ২০১৬ সালে বর্ষা মৌসুমেও পাহাড় ধ্বসে কক্সবাজার জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বন বিভাগের পাহাড়ে পরিকল্পনাহীন রোহিঙ্গা বসতি তৈরী এবং রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা তৈরীর জন্য নির্বিচারে পাহাড় কর্তন এবং বৃক্ষাচ্ছাদন ধ্বংসের ফলে মাটি উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে বর্ষায় রোহিঙ্গা বসতি এলাকায় পাহাড় ধ্বসের আশংকা তৈরী হয়েছে। ক্যাম্প এলাকাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস ও গাছের চারা রোপণ করা হলেও সেটি খুব পরিকল্পিত নয়। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল হতে জ্বালানী সংগ্রহ

পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী

Flyway Sites in Bangladesh

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে পরিভ্রমন করে থাকে তাকে উড়ন্ত পথ (Flyways) বলে। পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে, বাংলাদেশ East Asian- Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway এর অন্তর্ভূক্ত। East Asian-Australasian Flyway Partnership ৬ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। EAAFP এর সদরদপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত। EAAFP এর বর্তমানে ৩৭ টি Partners রয়েছে এর মধ্যে ১৮ টি দেশ, ৬ টি Intergovernmental agencies , ১২ টি International NGOs এবং ১ টি International private enterprise। এই Flyway Partnership উদ্দেশ্য হল সরকার, সাইট ম্যানেজার, বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, শিল্প ও সকল স্তরের সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং সহযোগিতা প্রচারের জন্য একটি ফ্লাইওয়ে বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা এবং পরিযায়ী পাখি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।

EAAF এর আওতায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব তিমুরসহ ২২ টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে EAAF এই উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি আন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে East Asian Australasian Flayway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (গাঙগুইরার চর, নিঝুম দ্বীপ, সোনাদিয়া, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর ও হাইল হাওর) Flayway Site ঘোষণা করেছে।

গাঙগুইরার চর

গাঙগুইরার চরটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব মেঘনা মোহনায় জেগে উঠা একটি চর। এটি এখনো মানব বসতিহীন একটি বিছিন্ন কাদাচর। এই চরটির পূর্বে হাতিয়া উপজেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ উপজেলা এবং উত্তরে জাহাজের চর অবস্থিত। ২০১৫-১৮ সালের একাধিক জরিপে গাঙগুইরার চর ও এর আশেপাশের চরাঞ্চলে প্রতিবছর সর্বমোট ৪২ প্রজাতির গড়ে ২৫,০০০ পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। এই বিশাল সংখ্যাটি বৈশ্বিক পরিযায়ী পাখিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া এই চরের পার্শ্ববর্তী মেঘনা মোহনা বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ডলফিন প্রজাতি ও ইলিশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর। ১৯৪০ এর দশকে এই দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর হতে জেগে উঠা শুরু করে। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল । ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

শীতকালে, বিশেষতঃ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-

২০,০০০ পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এই এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরল ও বিপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। বিশ্বব্যাপী অতি বিরল ও মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান *(Calidris pygmaea)* এদের মধ্যে অন্যতম।

সোনাদিয়া

সোনাদিয়া দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে এবং উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীর কুতুবজং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়া কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে ২.৬ কিলোমিটার দূরে। এবং সমুদ্র সৈকতে এর দৈর্ঘ্য ১৯.২০ কিলোমিটার। কক্সবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাগরের বুকে সোনাদিয়া দ্বীপটির অবস্থান।

সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ২৭ প্রজাতির পাখির দেখা মিলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এই পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা কচ্ছপ।

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রুপ জলমহালগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থিত জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের কাছে এ হাওরটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামে পরিচিত। বর্তমানে এ হাওরের মোট জলমহাল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে হিজল-করচ বন, নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়, যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। ২০২০ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৩৫ প্রজাতির ৫১,৩৬৮টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন পাখি প্রজাতির মধ্যে বৈকাল-তিলিহাঁস *(Sibirionetta formosa)*, দেখা মেলে। বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন ' এবং বিশ্বে 'বিপন্ন ' প্রাণী হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঈগলের *(Haliaeetus leucoryphus)* দেখা মেলে এই হাওরের

হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে। প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে।

হাকালুকি হাওর

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%), এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) এবং বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রায় সারাবছরই বিল গুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালিত জলচর পাখি শুমারী অনুযায়ী, ৫৩ প্রজাতির ৪০,১২৬টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন বেয়ারের-ভূতিহাঁস *(Aythya baeri)*, সংকটাপন্ন পাতি-ভূতিহাঁস *(Aythya ferina)*, প্রায়-সংকটাপন্ন মরচেরং-ভূতিহাঁস *(Netta rufina)* ইত্যাদি পাখি প্রজাতির দেখা মেলে।

হাইল হাওর

হাইল হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিয়দাংশে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এতে রয়েছে ১৪টি বিল এবং পানি নিস্কাশনের ১৩টি নালা। এই হাওরটির মোট আয়তন ১০হাজার হেক্টর। বাইক্কা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। ২০১১ সালে নতুন ৪টি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে এই বিলের চারপাশের বনে, সেগুলো হলো: বড়ঠুঁটি-নলফুটকি, উদয়ী-নলফুটকি, বৈকাল-ঝাড়ফুটকি ও সাইক্সের-ফুটকি।

বন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ৩১% ।

২. পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা ।

৩. রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরুএবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন আছে ।

৪. কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, সান ম্যারিনো, সেইন্ট ব্যাথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জেন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই ।

৫. প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে ।

৬. প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল ।

৭. পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে ।

৮. পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে ।

৯. পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশি Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয় ।

১০. পৃথিবীর মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেস্টেশন এবং ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয় ।

১১. পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে ।

১২. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ৮,৪৬,০০০ হাজার টন ।

১৩. বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ৫৭ টন ।

১৪. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ২,৭৮,০০০ হাজার টন ।

১৫. বাংলাদেশের বনে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১৯৩ টন ।

১৬. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ৪,২৩,০০০ হাজার টন ।

১৭. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ২৯ টন ।

১৮. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ১৩৯,০০০ হাজার টন ।

১৯. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ৯৬ টন ।

তথ্যসূত্রঃ i. National Forest Inventory 2016-2019
ii. FAO, UN-REED, UNDP, UNEP & IUCN website
iii.বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ

বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর

১. বন্যপ্রানী কি?

✓ সাধারণভাবে আমারা বন্যপ্রাণী বলতে বুঝি প্রকৃতিতে বসবাসকারী সকল ধরনের মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণী । **বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী বন্যপ্রাণী হল "বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাদের উৎস বন্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে"** । অর্থাৎ "Wildlife means All types and species of wild animals of their different stages of life cycle".

২. আমাদের চারপাশের বিদ্যমান টিকটিকি, কাক, টিয়া, চড়ুই, শালিক, মুনিয়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ও সাপ কি বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভূক্ত ?

✓ হ্যাঁ, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর বন্যপ্রাণীর সংঙ্গানুযায়ী এরা সকলেই বন্যপ্রাণী ।

৩. আমরা কি বাসায় পাখি পুষতে পারি?

✓ হ্যাঁ পারবেন বিদেশী বা কেইজবার্ড (যেমন-বারজিগর, লাভবার্ড, ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে-প্যারট ইত্যাদি) প্রজাতির পাখি। তবে দেশীয় কোন প্রজাতির পাখি নয় ।

৪. CITES কি ?

✓ **CITES** অর্থ হল Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

৫. আমরা কি হরিণের মাংস খেতে ও হরিণের চামড়ার ব্যবসা করতে পারবো ?

✓ না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী যে কোন বন্যপ্রানীর মাংস ও সকল বন্যপ্রাণী বা ট্রফি ক্রয়-বিক্রয় করা আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬. আমরা কি দেশীয় প্রজাতির পাখির ব্যবসা করতে পারবো ?

✓ না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ ।

৭. রাস্তায় যে সাপের খেলা বা বানরের খেলা দেখানো হয় সেটা কি বৈধ ?

✓ না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ব্যাতিত যে কোন প্রজাতির সাপ বা বানর ধরা, নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ ।

৮. রাস্তায় মাঝে মাঝে কবিরাজরা বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর অংশ নিয়ে (হাঙ্গরের হাড়, মাংশাসী প্রাণীর নখ, বনরুই এর চামড়া, মৃত বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর ট্রফি ইত্যাদি) ক্যানভাস করে ঔষধ বিক্রয় করে, এটি কি আইনগত বৈধ ?

✓ না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী অবৈধ। লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী বা নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ।

৯. বন্যপ্রাণী বিষয়ে যে কোন গবেষণার অনুমতি এবং হরিণ, হাতি লালন-পালনের জন্য লাইসেন্স ও বিদেশী পোষা পাখি লালন-পালন, আমদানী সংক্রান্ত এনওসি (NOC), লাইসেন্স কোথা থেকে প্রদান করা যায় ?

✓ বন্যপ্রাণী বিষয়ে গবেষণার অনুমতি, হরিণ ও হাতি লালন পালনের লাইসেন্স, বিদেশী পাখি আমদানির NOC বন সংরক্ষকের কার্যালয়, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা হতে প্রদান করা হয়।

✓ সৌখিন পর্যায়ে হরিণ পালনের পজেশন সার্টিফিকেট এবং বানিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশী পাখি পালনের লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্রে বন ও বন্যপ্রাণী

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মৌলভীবাজার

উপকূলীয় বন

রাস্তার ধারে সামাজিক বনায়ন

সুন্দরবনের হরিণ

সুন্দরবনের বাঘ (ক্যামেরা ট্র্যাপিং)

সুন্দরবনে SMART Patrolling

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০২০
সম্পাদনা ঃ তথ্যসেল, বন অধিদপ্তর।

মহামারি রুখতে বন্যপ্রাণী বাণিজ্য ও খাওয়া বন্ধ করি

জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগ পশুপাখি ও মানবদেহের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

বন্যপ্রাণীর **ব্যবসা-বাণিজ্যের** ফলে এরা মানুষের সংস্পর্শে চলে আসে এবং প্রাণী-সংক্রমিত রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণী মৃত হোক বা জীবিত, এদেরকে না ধরলে বা ব্যবসা- বাণিজ্য না করলে এরা সাধারণত রোগ ছড়ায় না বরং প্রকৃতিতে মুক্তভাবে বিচরণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ও পৃথিবীকে সুস্থ রাখে।

জীবাণু সংক্রমণ ৩ ভাবে হতে পারে

১ প্রাণী থেকে প্রাণীতে

২ প্রাণী থেকে মানুষে

৩ মানুষ থেকে মানুষে

জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ২০০ কোটিরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয় এবং ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

বন্যপ্রাণী খাওয়া ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কিছু রোগের সম্পর্ক

সিভিয়ার একিউট রেস্পিরেটরি সিনড্রোম (SARS-CoV)

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ২০০২ সালে।
চীনে গুয়াংজো শহরের বন্যপ্রাণী বাজারে প্রথম পাওয়া যায়।

আক্রান্ত সংখ্যা: ৮,০৯৮
মৃত্যু সংখ্যা: ৭৭৪
উৎস: বাঁদুড় থেকে ছোট স্তন্যপায়ী হয়ে মানুষে

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H5N1

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৯৬ সালে হংকং-এ।
২০০৩-২০০৬ সালে ৫৩ টি দেশে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ে।

আক্রান্ত সংখ্যা: ৮২৬
মৃত্যু সংখ্যা: ৪৪০
উৎস: বন্য জলজ পাখি থেকে গৃহপালিত হাস-মুরগী হয়ে মানুষে

এইচআইভি/এইডস

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৮১ সালে।
বাংলাদেশে প্রথম রোগী সনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে।

আক্রান্ত সংখ্যা: ৪৭,৫০,০০,০০০
মৃত্যু সংখ্যা: ৩,২০,০০,০০০
উৎস: বানর জাতীয় প্রাণীর রক্ত বা দেহ নিঃসৃত রসের মাধ্যমে মানুষে

ইবোলা ভাইরাস

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৭৬ সালে।
সবচেয়ে বড় মহামারি দেখা দেয় পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪-২০১৬ সালে।

আক্রান্ত সংখ্যা: ২৮,৬৫২
মৃত্যু সংখ্যা: ১১,৩২৫
উৎস: বাঁদুড় থেকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী হয়ে মানুষে

কোভিড-১৯ মহামারি

রোগটি প্রথমে স্থানীয়ভাবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এবং খুব দ্রুতই পুরো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে

ডিসেম্বর ২০১৯: চীনের লোকজন হঠাৎ করেই তীব্র সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হতে থাকে। ধারণা করা হয় নতুন এই রোগটি বাঁদুড় থেকে সরাসরি মানুষে অথবা বাঁদুড় থেকে অন্য কোন প্রাণী হয়ে মানুষে সংক্রমিত হয়েছে।

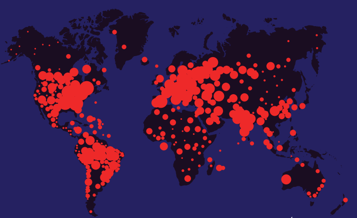

*আক্রান্ত সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ

*মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার

ডিসেম্বর — জানুয়ারি — ফেব্রুয়ারি — মার্চ — এপ্রিল — মে — জুন — জুলাই

*জুলাই ০৮, ২০২০ অনুযায়ী

অতীতে জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগ দেখা দিলে তার দ্রুতই অবসান হতো। এখন সাধারণত বাস, ট্রেন, নৌকা ও বিমান-এর মাধ্যমে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। যার ফলে প্রাণী-সংক্রমিত রোগগুলো খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটেছে। ভাইরাসটি চীনে উৎপত্তি লাভ করে এবং সাত মাসের ব্যবধানে ২১৬ টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় ও প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর এ সংখ্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী ব্যবসা-বাণিজ্য

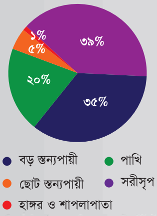

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস) বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৮ সালে সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পাচার ভৌগলিকভাবে বিস্তৃত একটি বড় ধরনের সমস্যা এবং এতে জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগের বাহকসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী অন্তর্ভুক্ত।

বন্যপ্রাণী আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। বন্যপ্রাণী খাওয়া বা এদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিরত থাকুন, মহামারি রুখতে এগিয়ে আসুন।

References: 1. Swift, L., et al. (2007). Wildlife trade and the emergence of infectious diseases. EcoHealth, 4(1), 25. 2. Karesh, W. B., et al. (2005). Wildlife trade and global disease emergence. Emerging infectious diseases, 11(7), 1000. 3. Greatorex, Z.F., et al. (2016). Wildlife trade and human health in Lao PDR: an assessment of the zoonotic disease risk in markets. PloS one, 11(3). 4. Chen, N., et al. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513. 5. Reynolds, M. G., et al. (2010). A silent enzootic of an orthopoxvirus in Ghana, West Africa: evidence for multi-species involvement in the absence of widespread human disease. The American journal of tropical medicine and hygiene, 82(4), 746-754. 6. Wildlife Conservation Society, (2018). Combating Wildlife Trade in Bangladesh: Current Understanding and Next Steps, Dhaka, Bangladesh. 7. Centers for Disease Control and Prevention: 2014-2016 Ebola outbreak in West Africa (https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/index.html) 8. Lau, S.K., et al. (2005). Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 102:14040– 14045, 9. World Health Organization: Global Health Observatory (GHO) data on HIV/ AIDS (https://www.who.int/gho/hiv/en/), 10. Rulli, M.C., et al. (2017). The nexus between forest fragmentation in Africa and Ebola virus disease outbreaks. Sci. Rep. 7: 41613

বন অধিদপ্তর
Gift of United States Government
WCS Bangladesh
A Wildlife Conservation Society Program

আসুন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করি, পৃথিবীকে সুস্থ রাখি।

বন ও বন্যপ্রাণী প্রকৃতির আধার
রক্ষার দায়িত্ব আপনার, আমার, সবার

মুজিব বর্ষের আহবান
লাগাই গাছ, বাড়াই বন

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়